কালী ও বঙ্গদেশ : কালীর প্রকারভেদ এবং বাংলায় কিভাবে দক্ষিণা কালীর পূজার প্রচলন হয়?

ড. মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

১. পটভূমি: দশমহাবিদ্যার প্রথম বিদ্যা হলেন কালীমাতা। দশমহাবিদ্যা সম্পর্কে তন্ত্রশাস্ত্রে একটি জনপ্রিয় কাহিনী আছে। পিতা দক্ষের যজ্ঞে গমনের ব্যাপারে দেবী সতী শিবের অনুমতি না পাওয়ায় ক্রোধে অগ্নিশর্মা হন। তখন দেবীর তৃতীয় নয়ন থেকে বহ্নি নির্গত হয়। দেবীর রূপ পরিবর্তিত হয়ে কালী বা শ্যামা হয়ে যায়। তিনি তখন শিবকে তাঁর দশটি ভয়ঙ্করী রূপ দেখিয়েছিলেন। তাঁর এই দশটি রূপ দশমহাবিদ্যা নামে খ্যাত।

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।।

বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।

এতে দশমহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্তিতা।।"

এখন দেখা গেল দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালী বা শ্যামাই জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ আসনে রয়েছেন।

কালের শক্তি বলে তিনি কালী। এই জড় জগতে তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় সাধন করেন।

২. কালীর প্রকারভেদ: কালী মাতার মূর্ত্তি আট ধরণের। নীচে এই আট মূর্ত্তির নাম দেওয়া হলো।

(ক). দক্ষিণা কালী

(খ). সিদ্ধ কালী

(গ). উগ্র কালী

(ঘ). গুহ্য কালী

(ঙ). ভদ্র কালী

(চ). শ্মশান কালী

(ছ). মহাকালী

(জ). চামুন্ডা কালী

বিভিন্ন সাধক এবং পূজক তার কামনা-বাসনার আলোকে বা প্রেক্ষিতে এক এক ধরণের কালী মূর্ত্তির উপাসনা করে। যেমন শান্তির জন্য ভদ্রকালীর পূজা করা হয়। আবার শত্রু দমনের জন্য উগ্রকালী, মহাকালী এবং চামুন্ডাকালীর উপাসনা করা হয়। কেউ কেউ বিভিন্ন গোপনীয় সিদ্ধি লাভের জন্য সিদ্ধ কালীর পূজা বা উপাসনা করে। তবে কালীর বিভিন্ন রূপের মধ্যে দক্ষিণা কালীর উপাসনাই সর্বাধিক প্রচলিত। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের দশম পটলে (অংশে) দক্ষিণা কালী নামের তাৎপর্য্য বর্ণনা করা হয়েছে।

"দক্ষিণস্যাং দিশিস্থানে সংস্থিতশ্চরবেঃ সূতঃ।

কালীনাম্না পলায়ত ভীতিযুক্ত: সমন্ততঃ।

অতঃ সা দক্ষিণাকালী ত্রিষুলোকেষু গীয়তে।।"

একই তন্ত্রে বলা হয়েছে যে দক্ষিণদিকে অবস্থিত দেশে সূর্য-পুত্র যমকালী নামে ভীত হয়ে ইতস্তত পলায়ন করেন। এজন্য দেবী ত্রিলোকে দক্ষিণা কালী নামে খ্যাত। বিভিন্ন কালীর - বিশেষত দক্ষিণা কালীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে কালী হলেন নির্গুণ ব্রহ্মের প্রকাশিকা। তিনি আদিরূপা এবং সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী (মুক্তি দায়িনী)। আবার বলা হয়েছে সমস্ত সিদ্ধ বিদ্যার মধ্যে দক্ষিণাকালী সকলের প্রকৃতি - অর্থাৎ কারণ।

৩. উভয় বাংলায় কিভাবে দক্ষিণা কালীর পূজার / উপাসনার প্রচলন হয়?

শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের নাম হয়তো অনেকেই শুনেছেন। তিনি কোন মূর্ত্তিতে কোন দেব-দেবীর পূজা করা উচিত এবং কিভাবে ঐ পূজা করতে হবে তার মোটামুটি বিস্তারিত বিবরণ তাঁর রচিত "তন্ত্রসার" বইতে উল্লেখ এবং বর্ণনা করেছেন। কালীর বিভিন্ন আকৃতি এবং প্রকৃতির কারণে উভয় বাংলায় তাঁর কোন মূর্ত্তির পূজা সাধারণ জনগণের জন্য শুভ হবে সে বিষয়ে তাঁর একসময় জানার ইচ্ছা হয়। এই লক্ষ্যে তিনি একদিন জগদম্বা আদ্যাশক্তির কাছে প্রার্থনা করেন, "মা, কোন মূর্ত্তিতে তুমি শীঘ্র প্রসন্ন হও, দয়া করিয়া বলিয়া দাও মা।" তখন তাঁর আকুতিতে জগন্মাতা বলেন:

"সম্মুখে চাহিয়া দেখ, ঐ মূর্ত্তিতে আমাকে পূজা করিলে জীব সহজে আমার কৃপা পাইবে।"

আগমবাগীশ দেখেন এক নীচ জাতীয় শ্যামবর্ণা যুবতী। তার দক্ষিণ চরণ (পা) বাড়িয়ে ঘুঁটে (গরুর মল গোবর দ্বারা তৈরী এক ধরণের জ্বালানী বস্তু) দেয়ালে গোবর ছড়িয়ে দিচ্ছে। আগমবাগীশ প্রণাম

করে উঠে দেখেন যুবতীও নেই এবং গোবরের ঝুড়িও নেই। এর ভিত্তিতে ঐ সময় থেকে উভয় বাংলায় দক্ষিণা কালীর পূজার প্রচলন আরম্ভ হয়। দক্ষিণা কালীর মূর্ত্তি সম্পর্কে তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হয়েছে -

"করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজম।

কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুন্ডমালা বিভূষিতাম।।

সদ্যচ্ছিন্নশির খড়্গ বামা ধোদ্ধং করাম্বজাম্।

অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণার্দ্ধে হধঃ পাণিকাম্।।"

অর্থাৎ বিকট-বদন, এলো চুল, গলায় নরমুন্ডের মালা। মায়ের চারটি হাত। তাঁর বাম হাতের একটিতে খড়্গ এবং অন্যটিতে সদ্যছিন্ন নরমুন্ড, যা থেকে রক্ত ঝরছে। আবার ডানহাতের একটিতে বর এবং অন্য হাতে ভক্তদেরকে অভয় দিচ্ছেন। দেবীর ডান পা একটু সম্মুখে বিক্ষেপিত। তাঁর এই ডান পা মহাদেব বা মহাকালের বুকের উপরে স্থিত।

বলা হয় যে কালীর দক্ষিণ চরণ (পা) অগ্রে অবস্থিত তাকে দক্ষিণা কালী বলা হয়। মায়ের গলায় যে মুন্ডমালা রয়েছে তার দ্বারা বোঝায় মা সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী। কারণ মুণ্ডেই (মাথায়) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) অবস্থিত। জ্ঞানের যে পাঁচ ধরণের প্রবাহ তা মস্তকেই প্রতিভাত হয়। কাজেই গলার মুন্ডমালা দ্বারা মাকে জ্ঞানের আধার হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। অন্যদিকে লোল-জিহ্বাকে দাঁত দ্বারা নিপীড়ণ (চাপিয়ে রাখা বা দংশনের বিষয়টি বোঝায় যে মা তাঁর ইচ্ছামত সব কিছু লয় / ধ্বংস করতে পারেন। এই অবস্থা জড়জগতে অবিরত লয় ক্রিয়ার বিষয়টি তুলে ধরে। মা যেন বলছেন, রসনা বা জিহ্বা সংযত কর। মায়ের পা মহাদেবের বুকে। মায়ের লালবর্ণের জিহ্বা রজঃ গুণের প্রতীক। আর সাদা দাঁত সত্ত্বগুণের প্রতিভূ। সাদা দাঁত দ্বারা লালবর্ণের জিহ্বাকে সংযত করার তাৎপর্য হল মা যেন জীবকে বলছেন সত্ত্বগুণ দ্বারা রজঃগুণ দমন করে তমঃগুণকে পদদলিত করে রাখ (কারণ মহাদেব তমঃ গুণের প্রতীক)।

৪.কালীমাতা শবরূপী মহাদেবের বুকের উপর ডান পা রেখে দন্ডায়মান কেন?

উপরোক্ত বিষয়ে দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে:- একটি হল প্রচলিত ব্যাখ্যা এবং অন্যটি শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা।

(ক). প্রচলিত ব্যাখ্যা: প্রচলিত ব্যাখ্যা হল কালীমা বিভিন্ন অসুর দমনের জন্য তাঁর উগ্র থেকে উগ্রতর রূপধারণ করেন এবং সামনে যাকে পান তাকেই সংহার করতে থাকেন। অনেক দৈত্য এবং অসুর

তাঁর খড়্গের আঘাতে নিহত হয়। একসময় অসুরগণ তাঁর সামনে আর যুদ্ধের জন্য এগিয়ে না এসে পালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু এতেও কালীমাতার ক্রোধের উপশম হয়না। তিনি সৃষ্টির সব কিছু ধ্বংসের জন্য কাজ করতে থাকেন। এতে দেবতা, ঋষি এবং মানবকূল অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। কেউ সাহসকরে এগিয়ে এসে মা-কে শান্ত করার জন্য ভূমিকা নিতে চাইছিলেন না। অথচ সৃষ্টি তখন ধ্বংসের পথে। কালীমা সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন আর যাই তাঁর সামনে পড়ছে তাই অবলীলাক্রমে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। তাঁর ক্রোধ থেকে সৃষ্টি রক্ষা এবং তাঁকে শান্ত করার জন্য দেবতা এবং ঋষিগণ সকলে মিলে শিবের স্মরণাপন্ন হন। সকলের অনুরোধে শিব তখন মা-এর পথে দাঁড়িয়ে থাকেন - তাঁকে ধ্বংসের ক্ষেত্রে নিবৃত্ত করার জন্য। এক সময় কালী-মাতা শিবের সামনে উপস্থিত হলে শিব ভূমিতে শয়ন করে - অর্থাৎ কালীমার যাওয়ার পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কালীমা-রতো সেদিকে লক্ষ্য নেই। তিনি সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাঁর ডান পা প্রসারিত করলে সেটি শিবের বুকের উপর পতিত হয়। শক্তিমানের স্পর্শে শক্তির (কালীমাতার) বাহ্যদশা ফিরে আসে - অর্থাৎ তিনি ধাতস্থ হন। দেখেন তাঁর ডান পা শিব তথা স্বামীর বক্ষে স্থাপিত এবং ঐ অবস্থায় তিনি (কালী) দাঁড়িয়ে আছেন। এই অবস্থায় তিনি (কালীমাতা) অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে দাঁত দ্বারা জিহ্বাকে নিপীড়ন করতে থাকেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তাঁর আর সামনে অগ্রসর হওয়া এবং ধ্বংস ক্রিয়া চালানো সম্ভবপর হয়না। এভাবে শিব (শক্তিমান) নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে নিজের শক্তিকে (কালী মাকে) নিষ্ক্রিয় করতে সমর্থ হন।

(খ). শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা: শক্তি এবং শক্তিমানের সম্পর্কের আলোকে এই ব্যাখ্যা প্রতিক্ষিত। সনাতন ধর্মের বৈষ্ণব দর্শনে শক্তি (শ্রীমতি রাধারাণী) এবং শক্তিমানের (শ্রীকৃষ্ণ) সম্পর্ক পরস্পর পরিপূরক। কিন্তু শাক্ত দর্শনে এই সম্পর্ক পরিপূরক নয়, বরং এই দর্শনে ব্যাখ্যা করা হয় যে সৃষ্টি-স্থিতি এবং প্রলয় কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে শক্তিমান নিষ্ক্রিয় থাকেন। এক্ষেত্রে শক্তিই মূল ভূমিকা পালন করেন।

শক্তিবাদে বিশ্বাসী তান্ত্রিকরা বিশ্বাস করেন যে মহাশক্তিরূপিণী কালী যখন সৃষ্টি-স্থিতি এবং প্রলয় কার্যে লিপ্ত হন তখন পরব্রহ্মরূপী শিব নিষ্ক্রিয় থাকেন। অর্থাৎ শক্তি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্মকে সামনে রেখেই বা আশ্রয় করেই। তাই মহাকালী শিবের উপর অবস্থান করেই সৃষ্টি-স্থিতি এবং প্রলয় কার্য সাধন করছেন। সূতসংহিতার উল্লেখ করে স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী উপরোক্ত ধরণের ব্যাখ্যার স্বপক্ষে যুক্তি দেন। এক কথায় বলা যায় তান্ত্রিকের শক্তি উপাসনা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা মাত্র। আর আদ্যাশক্তি মহামায়াই এক্ষেত্রে সগুণব্রহ্ম হিসেবে বিবেচ্য। শবরূপী শিব এক্ষেত্রে তাঁর অবলম্বন মাত্র।